আদিবাসী বা উপজাতি
(TRIBE)

ভূমিকা—

১৯৬০-৬১ সালে গঠিত 'সিডিউলড এরিয়াস অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইব' কমিশনের সভাপতি আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—"উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা জমির সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। জমির প্রতি তাঁদের অনুভূতি মালিকানা বা দখলের চাইতেও আরো কিছু বেশি। এই সম্পর্ক তাঁদের পুরানো ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় কারণ নিঃসঙ্গ পাহাড় ও বনাঞ্চলে প্রথম অভিযান তাঁরাই চালিয়েছে। তাঁদের পিতৃপুরুষের স্মৃতি এই বনাঞ্চলকে এখনো নাড়া দেয়। জমি তাঁদের হাতের পরিশ্রমে সাড়া দেয় এবং অভাবের সময়ে শতাধিক প্রাকৃতিক উপহার তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। এ হল একই সঙ্গে অভিযান, ভালবাসা, শিকার ও যুদ্ধের অনুভূতি যা কখনোই ভোলা যায় না। জমি উপজাতিদের কাছে নিরাপত্তার প্রতীক এবং শান্তির উদ্দেশ্যে শেষ রাস্তা"। উপজাতিদের কাছে জমি বলতে ব্যাপক অর্থে বনাঞ্চল, জীবজন্তু, গাছ-পালা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ও বনাঞ্চল ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে তাঁর 'আধুনিক ভারতে অনুন্নত সমাজ' নামক লেখায় উল্লেখ করেছেন, '১৯৬১ সালে ভারতবর্ষের জনগণনায় ৪৩.৯১ কোটি মোট জনসংখ্যার মধ্যে উপজাতি বা আদিবাসী মানুষদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। ১৯৭১ সালে এই জনসংখ্যা দাড়ায় প্রায় চার কোটিতে। সাধারণ বিশ্বাস মতো উপজাতি বা আদিবাসীদের ভারতীয় সমাজে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক বলে মনে করা হয়। সাধারণত তাঁরা বনাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকায় বেশি বসবাস করে এবং কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা স্বাধীনতা ছিল।

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে তফসিল উপজাতির তালিকা তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে নির্দিষ্ট কটি বিষয়ের নিরিখে উপজাতি বা আদিবাসীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। কয়েকটি বিষয়ের নিরিখে আদিবাসীদের চিহ্নিত করার কাজটা করা যেতে পারে, যেমন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে সম্প্রদায়গতভাবে বসবাস, তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার কিছুটা স্বায়ত্তশাসন এবং তাঁদের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে প্রাচীন সংঘের সহাবস্থান।

'ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার'-এ আদিবাসী বা উপজাতি সম্পর্কে কিছুটা ধারনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আদিবাসী বা উপজাতি বলতে একটি নিদির্ষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবার সমষ্টিকে বোঝায় যারা একটি সাধারণ নামে পরিচিত থাকে, অভিন্ন কথ্য ভাষায় কথা বলে, তাঁদের নির্দিষ্ট একটি জীবীকা থাকে, এদের প্রতিটি বংশ বা clan সাধারণত অন্তর্বিবাহ গোষ্ঠী নয়।

ডি.এন. মজুমদারও অনেকটা একই ভাবে ভারতবর্ষের আদিবাসী বা উপজাতিদের সংজ্ঞায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, আদিবাসী বা উপজাতি (Tribe) হলো একটি অভিন্ন নাম বহনকারী বেশকিছু পরিবারের সমষ্টি, যার সদস্যরা নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করে। একই ভাষায় কথা বলে, বিবাহ সম্পর্কিত বেশ কিছু ট্যাবু (taboos) বা বিধিনিষেধ তাঁরা অনুসরণ করে চলে। আদিবাসী বা উপজাতি সমাজে আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

উপজাতি বা আদিবাসী সমাজের বৈশিষ্ট্য সমূহ (features) :

সমাজতাত্ত্বিক এ.আর. দেশাই ভারতবর্ষের উপজাতি সমূহের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন—

(১) এই উপজাতিরা সাধারণত সভ্য সমাজ থেকে দূরে জঙ্গল বা পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে।
(২) এরা নেগ্রিটো, মঙ্গলয়েড বা অস্ট্রালয়েড প্রজাতির হয়।
(৩) এরা উপজাতীয় উপভাষায় কথা বলে।
(৪) এরা সর্বপ্রানবাদ (animism)-এ বিশ্বাস করে।
(৫) এদের মধ্যে অনেকেই আদিম পেশায়- যেমন, শিকার করা, অরণ্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ধারণ করে।
(৬) এরা মূলত মাংসাসী
(৭) এদের মধ্যে অনেকে প্রায়-নগ্ন থাকে, গাছের ছাল বা পাতা পরিধাণ করে।

উল্লেখযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা আরও বিশদে ভারতবর্ষের উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে পারি—

বসবাসের নির্দিষ্ট অঞ্চল (definite common topography) :

প্রতিটি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা একটি নির্দিষ্ট ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। যেমন, ওরাঁও, মুন্ডা, সাওঁতাল, উপজাতিরা বাস করে বিহারে। মেঘালয়ে বাস করে চাকমা, গারো, খাসি। সিকিমে ভুটিয়া, লেপচা, প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

সাধারণ নাম (Common name) :

প্রতিটি আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র নাম থাকে যার সাহায্যে তাদের অন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা, গারো, লেপচা, নাগা ইত্যাদি এমনই কিছু নাম।

সাধারণ ভাষা (C.ommon dialect) :

একই উপজাতিদের ব্যবহৃত ভাষাও এক। উপজাতি গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের নিজস্ব কথ্য ভাষা ব্যবহার করে। সেই ভাষার লিপি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অনেক উপজাতি ভাষার ক্ষেত্রে নিজস্ব লিপির অভাবে এদের মধ্যে নিরক্ষরতাও অনেক বেশি দেখা যায়।

একতাবোধ (Sense of unity) :

প্রতিটি উপজাতি গোষ্ঠী এক একটি অন্তর্গোষ্ঠী (Ingroup)। তাদের সমষ্টিগত মানসিকতা (Commmunity sentiment) খুব শক্তিশালী। উপজাতি মানুষদের স্বতন্ত্রভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি তাঁদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ গড়ে তোলে। নিজ গোষ্ঠীর সুরক্ষা সম্পর্কিত চেতনা এদের মধ্যে অতি মাত্রায় প্রবল।

স্বতন্ত্র ধরণের সংস্কৃতি (distinctive culture) :

উপজাতি বিশেষে স্বতন্ত্র জীবনচর্যা থাকে। সনাতনী উপজাতি গ্রামগুলি ছিল একটি অখন্ড একক। তাঁদের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা, ভাষা, সংগীত, নৃত্য অর্থাৎ সামগ্রিক চেতনা অভিন্ন। সেই সময় ভারতের অধিকাংশ উপজাতি জনগোষ্ঠীরই ভারতের মূলধারার সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতবর্ষেও তাকে মূল সাংস্কৃতিক স্রোতে মিলিয়ে দেওয়ার বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে বৃহত্তর সমষ্টির সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্কোচ এখনো যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যমান।

প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্ম (Rudimentary type of religion) :

উপজাতিদের ধর্ম খুব প্রাথমিক পর্যায়ের। যাদুবিদ্যার (magic) সেই সময় যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এঁরা পূর্বপুরুষদের পুজা করে। তাছাড়াও সর্বপ্রাণবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। ধর্মপালনকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসব (festival) আছে এবং ধর্মীয় আচরণের নির্দিষ্ট বিধি আছে।

স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন (Distinct polical organisation) :

প্রতিটি উপজাতি গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন আছে। সেই উপজাতি সমাজের প্রবীন মানুষদের নিয়ে গঠিত পরিষদই সামাজিকভাবে গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে এই রাজনৈতিক সংগঠন সবসময় সজাগ এবং সক্রিয় থাকে। এদের মধ্যে সমমাত্রিকতা বা সমানাধিকারের মূল্যবোধ খুব বেশি।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (Economic activities) :

ভারতবর্ষে উপজাতিদের জীবীকা নির্বাহের মূল উৎস হলো কৃষিকাজ, শিকারকরা, মাছধরা,

Scanned with CamScanner

সমকালীন ভারতের আদিবাসী বা উপজাতি— সাম্প্রতিক প্রবণতা (Tribes in Contemporary India : recent trends)

ভারতবর্ষের সংবিধানে উপজাতি গোষ্ঠী সমূহের প্রথাগতভাবে ভূমি ও অরণ্যের ওপর অধিকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও ঐতিহ্যর রক্ষায় দায়িত্ব গ্রহণের কথা স্বীকৃত হয়েছে। আবার পাশাপাশি, এটাও আশা করা হয়েছে যে, এইসব অনগ্রসর ও বিচ্ছিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী সমূহ অদূর ভবিষ্যতে ভারত রাষ্ট্রের 'মূল ধারার' সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হবে। প্রতি দশবছর অন্তর পর্যালোচনা করে দেখা হবে কোন কোন উপজাতির উন্নতি হয়েছে এবং তারা অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত হয়ে, 'মূলধারার' সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে? অধ্যাপক সুরজিৎ সিংহর মতে,

Scanned with CamScanner

সেই সময় ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের অনেকেই একথা মনে করতেন যে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির 'আত্মপরিচয়' ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধক। অধ্যাপক সুরজিৎ সিংহ মনে করেন, এইসব কারণেই বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ উপজাতি জনগোষ্ঠী বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে 'উপজাতি বা আদিবাসী সমস্যা'— এই অস্বস্তিকর নাম দিয়ে। উপনিবেশবাদী এই চিন্তার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের বেশ কিছু উপজাতি জনগোষ্ঠীকে 'ক্রিমিনাল ট্রাইব' আখ্যা দেওয়া।

অধ্যাপক আদ্রেঁ বেতের মতে, ভারতবর্ষের আদিবাসীরা সতত পরিবর্তনশীল। অনেক আগে থেকেই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক সীমানা ভেঙ্গে পড়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে এই সমাজের এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁদের সামাজিক এবং পরিবেশগত বিচ্ছিন্নতা। যদিও অধ্যাপক বেঁতের মতে, বাইরের জগতের মানুষের সঙ্গে এঁদের ওপর ওপর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহু শতাব্দী ধরেই ছিল। উপজাতি সমাজের একাংশ এক ব্যাপক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হচ্ছে। বেঁতের মনে উপজাতি এবং আদিবাসী এই দুটি ধারণার মধ্যে সামান্য হলেও পার্থক্য আছে, তবে তা চিহ্নিত করা খুব কঠিন। স্বকীয়তা ও স্থান-পরিপ্রেক্ষিতে তা করতে হবে। তফসিল উপজাতিদের তালিকা তৈরি করার সময়ও নানা ধরণের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বিচার করা হয়েছিল।

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর 'দ্য হিন্দু মেথড অব্ ট্রাইবাল অ্যাবসরপ্সন' প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন যে, অনগ্রসর উপজাতিগোষ্ঠী ক্রমশই আর্থিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তার অংশ হয়ে পড়েছে। তাঁদের সংস্কৃতিতে উপজাতি লোকাচারের স্বাতন্ত্র্য যেমন দেখা যায় তেমনি তাঁদের জীবন যাত্রায় হিন্দু সমাজের 'মূল ধারার' সংস্কৃতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। উপজাতিরা তাঁদের নিজস্ব উৎসব, পূজা-পদ্ধতি, বিশ্বাস ইত্যাদি চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গে বহু হিন্দু রীতি নীতিকে আত্মস্থ করে ফেলেছেন। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দু সমাজ বিরোধী ক্ষোভ তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

Scanned with CamScanner

ভারতবর্ষে উপজাতি জনসংখ্যা-জনগণনা ২০১১ (Scheduled Tribe population in India- Census 2011)

রাজ্য	গৃহস্থলি পরিবারের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা উপজাতি	পুরুষ	নারী	শিশু (০-৬)	সাক্ষরতার হার	লিঙ্গঅনুপাত
ভারতবর্ষ	২১৫১১৫২৮	১০৪৫৪৫৭১৬	৫২৫৪৭২১৫	৫১৯৯৮৫০১	১৬.০১%	৫৮.৯৫%	৯৯০
১)মধ্যপ্রদেশ	৩,১২২,০৬১	১৫,৩১৬,৭৮৪	৭,৭১৯,৪০৪	৭,৫৯৭,৩৮০	১৮.৪৬%	৫০.৫৫%	৯৮৪
২)ওড়িশা	২,১৬৩,১১০	৯,৫৯০,৭৫৬	৪,৭২৭,৭৩২	৪,৮৬৩,০২৪	১৫.৮৬%	৫২.২৪%	১০২৯
৩)মহারাষ্ট্র	২,১৫৬,৯৫৭	১০,৫১০,২১৩	৫,৩১৫,০২৫	৫,১৯৫,১৮৮	১৪.৭৮%	৬৫.৭৩%	৯৭৭
৪) রাজস্থান	১,৭৮৭,৭১৫	৯,২৩৮,৫৩৪	৪,৭৪২,৯৪৩	৪,৪৯৫,৫৯১	১৮.৪০%	৫২.৮০%	৯৪৮
৫)ছত্তিশগড়	১,৭৪৩,২৭৭	৭,৮২২,৯০২	৩,৮৭৩,১৯১	৩,৯৪৯,৭১১	১৫.৩৩%	৫৯.০৯%	১০২০
৬)গুজরাট	১,৬৯৯,৫১০	৮,৯১৭,১৭৪	৪,৫০১,৩৮৯	৪,৪১৫,৭৮৫	১৫.৮৫%	৬২.৪৮%	৯৮১
৭)ঝাড়খন্ড	১,৬৯৯,২১৫	৮,৬৪৫,০৪২	৪,৩১৫,৪০৭	৪,৩২৯,৬৩৫	১৬.৯৭%	৫৭.১৩%	১০০৩
৮)অন্ধ্রপ্রদেশ	১,৪১৭,২৮৯	৫,৯১৮,০৭৩	২,৯৬৯,৩৬২	২,৯৪৮,৭১১	১৩.০৩%	৪৯.২১%	৯৯৩
৯)পশ্চিমবঙ্গ	১,১৬০,০৬৯	৫,২৯৬,৯৫৩	২,৬৪৯,৯৭৪	২,৬৪৬,৯৭৯	১৩.১৭%	৫৭.৯৩%	৯৯৯

Scanned with CamScanner

২০১১-এর জনগণনার হিসেবে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ উপজাতি। এঁদের অধিকাংশই প্রত্যন্ত ও অনগ্রসর অঞ্চলে বসবাস করে। এরা কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। ভারতবর্ষে মোট উপজাতি জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশই গ্রামে বাস করে।

উপজাতিদের সাক্ষরতার হার ২০১১ এর জনগণনার হিসেবে ৫৮.৯৫ শতাংশ যা ভারতবর্ষের সাক্ষরতার হার ৭২.৮ শতাংশের অনেক কম। উপজাতি ছাত্রদের বিদ্যালয়-ছুটের (drop-out) হার ৭০.৫ শতাংশ যা জাতীয় গড় ৪৯.১৫ শতাংশের থেকে অনেক বেশি।

২০১১ সালের জনগণনার হিসেবে উপজাতি সমাজের লিঙ্গ অনুপাত ৯৯০ যা জাতীয় গড় ৯৪০ এর থেকে অনেকটা ভালো। উপজাতি সমাজে শিশু মৃত্যুর হার (IMR) ৬২.১ অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা ৫৭।

প্রায় ৪৫০টি স্বতন্ত্র উপজাতি ভারতে বসবাস করে। এক একটি উপজাতির জনসংখ্যা হল ৪০ লক্ষ থেকে ২৪ জন। গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসবাসকারী উপজাতিদের গায়ের রঙ কালো, মুখ গোল, নাক চাপা এবং কপাল নীচু। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিরা 'মঙ্গোলীয়' দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অনেক উপজাতি সম্প্রদায়ই, বিশেষত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি, তাদের আদি ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এবং বর্তমানে তারা ভারতের প্রধান ভাষাগুলির একটিতে কথা বলে। যেমন, মধ্যভারতের গোণ্ড সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ভাষা জানে না। যে অঞ্চলে তারা বসবাস করে তার ভিত্তিতে হিন্দী, মারাঠী ও তেলেগু ভাষায় কথা বলে।

বিভিন্ন তফশিলী উপজাতিগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আসীন। এই স্তরগুলি হল শিকার, বনজ খাদ্য আহরণ, পশুচারণ, স্থানান্তরিত কৃষিকার্য এবং স্থায়ী কৃষিকার্য। এরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশেরও বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। এই স্তরগুলি হল সাক্ষরতা-পূর্ব/অর্ধসাক্ষর অথবা যাযাবর/স্থায়ী বসবাসকারী অথবা মাতৃতান্ত্রিক/পিতৃতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থা-সমন্বিত ইত্যাদি। উপজাতীয় জনগণের অধিকাংশই তাদের আদিম জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনুসরণ করে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কৃষ্টিমিশ্রণ (acculturation)-এর ফলে তাদের আদিম ও নিজস্ব জীবনযাপন প্রণালীতে বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। শিকারী এবং বনজ খাদ্য আহরণশীল উপজাতিগুলি হল আন্দামানী, জারোয়া, ওঙ্গে, বীরহোড়, চেঞ্চু, কাদার, কুরুম্বা ইত্যাদি। টোডা, বাগাদা, কোটা প্রভৃতি উপজাতি হল পশুচারণরত। খোন্দ, ভুইয়া, কোরওয়া, পাহারিয়া, নাগা ইত্যাদি উপজাতি জীবিকা হিসেবে স্থানান্তরিত কৃষিকার্য অবলম্বন করেছে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ উপজাতি গোষ্ঠী—যেমন সাঁওতাল, গোন্দ, ওরাওঁ, মুন্ডা প্রভৃতি স্থায়ী কৃষিকার্যে রত। পণ্যবিক্রয় করে লাভ করার আশায় তারা সাধারণত চাষ করে না। অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে এখনো টাকার বিনিময়ে লেনদেন খুব বেশি প্রচলিত হয়নি। তারা এখনও নিজেদের মধ্যে সরাসরি দ্রব্যাদির বিনিময় করে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপজাতিদের ব্যয়ের হার অত্যন্ত বেশি। তাদের মধ্যে বহু নিরক্ষর আছে।

❑ **ভারতীয় উপজাতি সমাজের মূল সমস্যা :**

উপজাতীয়দের ঐতিহ্যগতভাবে বনের ওপর একটা অধিকার ছিল। তারা বন থেকে

Scanned with CamScanner

শুধু যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করত তাই নয়, বনের কাঠে তারা ঘর বাঁধত, বন্য শেকড় তারা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করত, বনের ভেতর তারা নাচগান ও খেলা করত। কিন্তু পরবর্তীকালে উপজাতিরা বনভূমির উপর তাদের স্বাভাবিক অধিকার হারায়। বনভূমি পুরোদস্তুর সরকারি অধিকারে চলে যায়। বনের বাইরে যেসব জমি কিছু কিছু উপজাতীয় লোকের অধিকারে ছিল সেগুলোও ধীরে ধীরে অন-উপজাতীয় লোকেরা কিনে নিতে থাকে বা অন্যভাবে গ্রাস করতে থাকে। এইভাবে উপজাতীয়রা তাদের বন ও জমি সবই হারাল। নিজেদের দেশেই যেন তারা এখন বহিরাগত।

জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার হ্রাসের ফলে—যেমন, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবহারে বাধা আসায়—পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত না হওয়ায় উপজাতিদের বিস্বাদ ও অখাদ্য শিকড় ও কন্দ খেয়ে জীবনধারণ করতে হচ্ছে অথবা বেশ কিছু কালের জন্য অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। অনেক অঞ্চলেই বাসস্থান নির্মাণের উপাদানও দুর্লভ। সুতরাং তারা খাদ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু বিশেষ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে এক অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। এর দৃষ্টান্ত হল উড়িষ্যার বন্দোপরোজা এবং আন্দামানের ওঙ্গে ও জারোয়া গোষ্ঠী।

উপজাতীয়রা যুগে যুগে জমিদার মহাজন, বনের কন্ট্রাক্টর এবং সরকারি কর্মচারী প্রভৃতির দ্বারা শোষিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের নীতি উপজাতীয়দের স্বার্থের বিরোধিতা করেছে। বর্তমানেও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা এত কম যে তাদের এখনও মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়।

উপজাতীয় জনসাধারণের প্রায় ৯০ শতাংশ বর্তমানে কৃষিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভূমিহীন কৃষক। অনেকে জীবিকা হিসেবে 'স্থানান্তরিত কৃষিকার্য' অবলম্বন করে থাকে। যাদের নিজেদের জমি আছে তাদেরও সেই জমির পরিমাণ এত কম যে তাতে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়। শিকার, বনজ খাদ্যসামগ্রী আহরণ, পশুচারণ ও কৃষিকার্য ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনশীল ও লাভজনক অর্থনৈতিক পেশায় উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ নগণ্য। অতএব দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী।

সরকারি নীতি হল স্থানান্তরিত কৃষিকার্য বা ঝুমচাষের বিস্তার হ্রাস করা, স্থায়ী কৃষিকার্য বা ধান চাষ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা, আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে নতুন কৃষি কৌশল প্রয়োগ করা এবং কৃষিখাতে পুঁজি বিনিয়োগ বর্ধিত করা। এই অঞ্চলগুলিতে সরকারি এজেন্সীর দ্বারা উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমন অভিনব কৃষি-প্রযুক্তির বিকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে যা খরাপ্রবণ এলাকা ও পার্বত্যাঞ্চলে ফলদায়ক হবে। তবুও বর্তমানে স্থায়ী কৃষিকার্যের অধিকাংশ জীবিকা নির্বাহের স্তরেই সীমিত এবং আদিবাসীরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ পায় না। অনেক সময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার জন্য তারা আপৎকালীন ভাবে উৎপাদিত শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

বেশ কিছু উপজাতি গোষ্ঠীগতভাবে অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। উপজাতীয়দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পার্বত্য, আরণ্যক ও

Scanned with CamScanner

অন্যান্য দুর্গম এলাকায় বসবাস করে বলে সমতলের জনসাধারণের সাথে তাদের যোগাযোগ খুবই কম। জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে।

এসব কারণে উপজাতীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েই চলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে উপজাতীয় আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ ভালো রকম মাথা চাড়া দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অনুপজাতীয়দের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণের রূপ নিয়েছে। এইসব উপজাতীয়রা অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে পুলিশ এবং এমনকি সামরিক বাহিনীকেও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে এবং অনুপজাতীয়দের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। সমতলেও পূর্বাঞ্চলে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য উপজাতীয়দের রাজনৈতিক সংগ্রাম এক সময়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ভারত সরকার বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ড এবং উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল নামক দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করার ওইসব অঞ্চলে উপজাতীয়দের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের এই সিদ্ধান্তগুলি অন্যান্য অঞ্চলে উপজাতীয় আঞ্চলিকতাবাদকে শক্তিশালী করে তুলছে। পশ্চিমবঙ্গে 'গোর্খা হিল কাউন্সিল' গঠিত হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ডের দাবি পুরোপুরি নির্বাপিত হয়নি। এছাড়া কামতাপুরী আন্দোলন ও বৃহত্তর কোচবিহারের জন্য আন্দোলন ক্রমশই দানা বাঁধছে।

স্বাধীনতার পরে উপজাতীয়দের অবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। সংবিধান সভা উপজাতীয়দের সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য এ. বি. ঠক্করের নেতৃত্বে একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করে। ঠক্করের সুপারিশবলে উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি উন্নতি সমগ্র ভারতীয় জনজীবনের উন্নতির আবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

❑ উপজাতি বিকাশের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা :

তফশিলী উপজাতিসমূহের উন্নতিবিধান এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক, আইনগত ও প্রশাসনিক বহু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ৪৬, ২৪৪, ২৭৫, ৩৩০, ৩২২, ৩৩৪, ৩৩৫, ১৫, ১৬, ১৯, ৩৪১, ৩৪২ প্রভৃতি ধারা উল্লেখযোগ্য। এদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সংবিধানের ২৪৪নং ধারা এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফশিলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তফশিলভুক্ত এবং উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলির প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। তফশিলী জাতিদের যেসকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলিই তফশিলী উপজাতিদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। যেমন, তফশিলী জাতিগুলির জন্য নিযুক্ত কমিশনার তফশিলী উপজাতিদের জন্যও নিযুক্ত। প্রতিটি রাজ্য সরকারের অধীনে তফশিলী জাতিসমূহের উন্নতির জন্য যে পৃথক দপ্তর আছে সেটি তফশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণিগুলির কল্যাণেরও ভারপ্রাপ্ত। তফশিলী জাতির ছাত্রদের জন্য যেসব বিশেষ শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা আছে (যেমন, আই. এ. এস. ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিকের পরবর্তী শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ বৃত্তি, বিভিন্ন স্তরের ছাত্রীদের বসবাসের জন্য মহিলা হোস্টেল, ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠরত ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

সেগুলি তফশিলী উপজাতির ছাত্রদের জন্যও প্রাসঙ্গিক।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির শুরু থেকেই উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সার্বিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির জন্য ছক কষা হচ্ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হল। দেখা গেল যে কতকগুলি উপজাতি সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কিন্তু অধিকাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ই এসব ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে আছে। আবার নির্দিষ্ট উপজাতি সম্প্রদায়গুলিতেও কিছু ব্যক্তি ওই সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের তুলনায় বেশ ভালো আছে দেখা গেল। এই বৈষম্য বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট কিছু কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছিল। বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও বৈষম্য দেখা দিচ্ছিল। অতএব পঞ্চম পরিকল্পনার সূচনায় উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য একটি নতুন পন্থা অবলম্বন করা হল। যে সকল অঞ্চলের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি উপজাতীয় জনগণ সেগুলিকে চিহ্নিত করে সেসকল অঞ্চলের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হল। কিন্তু এই নতুন পন্থাতেও দেশের সমগ্র উপজাতীয় জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশকে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা গেল। উপজাতীয় জনগণের বাকী এক-তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেল। তাদের সমস্যার প্রতি কোনো নজর দেওয়া হল না। পশ্চিমবঙ্গের উপজাতীয় জনগণের মাত্র ৩৮ শতাংশ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সংবিধান অনুযায়ী উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে 'দায়বদ্ধ শ্রম' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এইসব দায়বদ্ধ শ্রমিকদের ৮০ শতাংশ ছিল তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি সমাজের মানুষ। উপজাতিদের মধ্যে মহাজনদের প্রতিপত্তি কমানোর জন্য সরকার কতকগুলি Large Area Multi-purpose Society স্থাপন করেছে। অবশ্য উপজাতিদের উন্নয়নে এদের কাজকর্ম খুব একটা ভালো হয়নি। সমবায় সমিতিগুলিও উপজাতিদের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে, উপজাতিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে কৃষিজ ও বনজ সামগ্রী ক্রয় করার ব্যবস্থা করতে এবং উপজাতিদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্যের দোকান যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপজাতি সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দু'দিক থেকে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রথমত, উপজাতীয় জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। উপজাতি উন্নয়নের sub-plan গুলি বর্তমানে ১৮৪টি Integrated Tirbal Development Project-এর মাধ্যমে কার্যকরী করা হচ্ছে। এই I.T.D.P.-গুলি ৭৩টি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের উন্নতি বিধান করছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় উপজাতিদের জন্য পরিকল্পিত sup-plan-এ ১,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল ৫,৫৩৫ কোটি টাকা এবং সপ্তম পরিকল্পনার সময় এই টাকার বরাদ্দ ছিল ১০, ৫০০ কোটি টাকা। অবশ্য এই Tribal sub-plan-গুলিতে যে উপজাতীয় জনগণের এক-তৃতীয়াংশ সামিল হয়নি তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি প্রণীত হয়েছিল যেগুলি আজও প্রাসঙ্গিক।

Scanned with CamScanner

সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) কৃষিকার্য, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প, ফুলের চাষ এবং পশুপালনের ক্ষেত্রে উপজাতীয় লোকেদের বেশি পরিমাণে নিযুক্ত করে তাদের আয় বাড়ানো;

(খ) ধার ও সুদের ব্যবসা, দায়বদ্ধ শ্রম, বনজ সামগ্রীর চোরাচালান, মদের বিক্রী প্রভৃতির মাধ্যমে উপজাতীয়দের যেভাবে শোষণ করা হয় তার অবসান ঘটানো;

(গ) উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও নানা বিষয়ে শিক্ষানবিশীর সুবিধা বাড়ানো; এবং

(ঘ) উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উন্নতিবিধান ও সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মান উন্নয়ন করা।

বর্তমানে উপজাতীয়দের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদি উপযুক্ত দামে বাজারে বিক্রয়ের জন্য Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India স্থাপিত হয়েছে। এর কার্যকলাপের মাধ্যমেও উপজাতীয়দের উপর শোষণের হার কিছুটা কমেছে এবং তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপযুক্ত দাম পাচ্ছে।

উপজাতীয়দের সার্বিক উন্নতির ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজমান। এগুলি হল—সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী।

সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে উপজাতীয়দের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা বাঞ্ছনীয়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে বহু ব্রিটিশ প্রশাসক অনুভব করতেন যে উপজাতীয়দের জীবনধারায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এ কারণে ব্রিটিশ সরকার উপজাতীয়দের অন্যান্য জনসাধারণের থেকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। কিছু কিছু নৃতত্ত্ববিদও এই দৃষ্টিভঙ্গীর শরিক।

আত্তীকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে উপজাতীয়দের সম্পূর্ণভাবে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটা উৎস হল অধ্যাপক ঘুরের তত্ত্ব যাতে তিনি বলেছেন যে উপজাতীয়রা হল পশ্চাদ্‌পদ হিন্দু এবং কৃৎকৌশলের দিক থেকে অগ্রণী জনগণ এদের বন ও পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়ে দিয়েছে। এই মতবাদের ভিন্ন প্রবক্তারা হলেন খ্রিস্টান মিশনারীরা। এঁরা অনুভব করেছিলেন যে উপজাতিদের সমস্যা দূর করার একমাত্র পন্থা হল তাদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে আধুনিক জীবনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা।

সংহতিকামী দৃষ্টিভঙ্গী :

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে উপজাতীয়দের বিশেষ স্বকীয়তাকে নষ্ট না করেই জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে তাদের সামিল করার প্রচেষ্টা করা উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতি হল নকশার মতো যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। নৃতত্ত্ববিদরা উপজাতীয়দের প্রয়োজনকে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। উপজাতীয়দের উন্নয়নের পথনির্দেশিকা নীতি হিসেবে জওহরলাল নেহেরুর চিন্তাধারাকে ভেরিয়ার এলউইন 'আদিবাসী পঞ্চশীল' নামে প্রবর্তন

করেছিলেন। এই নীতিগুলি হল ঃ আধিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নতি করবে; প্রভাবশালী জনগণ তাদের উপর কিছু চাপিয়ে দেবে না; ভূমি ও বনাঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকারকে মানতে হবে; উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করা উচিত; আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে কোনো প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশাসন থাকবে না; আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেই কাজ চালানোর প্রচেষ্টা করতে হবে; এবং এসবের ফলাফল অর্থব্যয়ের পরিমাণের উপর নয়, বরং কি ধরনের মানবিক চরিত্র বিকশিত হল তার উপর নির্ভর করবে।

উপরোক্ত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী একে অপরের থেকে পৃথক নয়, বরং তারা পরস্পরের পরিপূরক। উপজাতীয়রা তাদের যেসব সাংস্কৃতিক উপাদানকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে সেগুলিকে অবশ্যই গোটা জাতির তরফে সংরক্ষণ করা উচিত। আবার উপজাতীয়দেরও উচিত অন্যান্য জনগণের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্বীকার ও গ্রহণ করা এবং এভাবে তাদের সাথে শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

Scanned with CamScanner